সংবাদ

তারিখ ... 20 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

ফিচার

বেহাগা গ্রামে নিরক্ষর নারীদের সম্পৃক্ততায় একটি স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষা উদ্যোগ

মানিক মাহমুদ

গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে বিভিন্ন এলাকার বহু স্থানীয় টেকসই উন্নয়ন উদ্যোগ আমার দেখার সুযোগ ঘটেছে। এ সব উদ্যোগে দেখেছি মানুষ কিভাবে পরনির্ভরশীল মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের সীমিত সম্পদ নিয়ে অনেকের কাছে যা অসম্ভব, বিস্ময়কর তা সহজেই অর্জন করে চলেছে। দেখেছি এ সব অর্জনের পেছনে শক্তি হিসাবে কাজ করে মানুষের দৃঢ় মনোবল এবং সমবেতভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চর্চা- এসব মানুষের অধিকাংশই নিরক্ষর হলেও তারা অগ্রসর হয়েছে এই উপলব্ধি নিয়ে যে, 'নিজেদের প্রয়োজনে নিজের কাজ নিজেরা করছি'। এ এক গভীর মালিকানাবোধ। (অধিকাংশ নিরক্ষর) 'গবেষকদের এজন্য অন্যের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়নি। কোন এনজিওর জন্য বা হয়ত (বাইরের গবেষকদের জন্য) এক বিরাট গবেষণার বিষয়। বর্তমান নিবন্ধ ছোট একটি স্থানীয় উদ্যোগ সম্পর্কে, যেখানে স্থানীয় নারীদের রয়েছে গভীর সম্পৃক্ততা। এ উদ্যোগ মোটেই হঠাৎ গড়া কোন ঘটনা নয়, একটি স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। আরও পরিচর্যা পেলে তা বড় কোন দৃষ্টান্ত হয়েও উঠতে পারে ভবিষ্যতে।

• একজন নারীর বক্তব্য দিয়েই শুরু করা যাক-

'আমি আমার গ্রামের প্রতিটি নিরক্ষর নারীর কথা জানি, তাদের প্রত্যেকের সামনে একটা করে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, যা কেউই অতিক্রম করতে পারবে না। নিরক্ষরতার কারণে তাদের জীবনটা অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। আমি যখন হাইস্কুলে পড়ি তখনই দেখেছি নিরক্ষর নারীদের দুঃসহ যন্ত্রণাময় জীবন, আমি এমন জীবন চাইনি। চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম বলেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ভর্তি হতে পেরেছি।... কিন্তু আমি একা শিক্ষিত হয়ে স্বার্থপরের মতো পালিয়ে বেড়াতে চাই না। গ্রাম থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য নিনিংফুল একটা কিছু করতে চাই। ...আমিই প্রথম আমাদের গ্রাম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, আমার দেখাদেখি এখন অবশ্য অনেকে কলেজ পর্যন্ত গেছে। আমি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছি।...আমরা যে 'ছাত্র কল্যাণ সমিতি' গড়ে তুলেছি, তার মাধ্যমে গ্রামকে নিরক্ষরমুক্ত করে বেহাগাকে একটি 'আদর্শ' গ্রামে রূপান্তরিত করতে চাই। এখন আমরা চেষ্টা করছি এ প্রক্রিয়া যাতে করে ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকে, আমরা না থাকলেও যেন তা বাধগ্রস্ত না হয়।...তবে এটা আমরা দ্রুতই উপলব্ধি করি যে, শুধু নারীদের আলাদা করে নিরক্ষরমুক্ত করে এবং শুধু বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের সংগঠনের উদ্যোগে বেহাগাকে আদর্শ গ্রাম বানানো সম্ভব নয়, দরকার সমবেত সংগঠিত উদ্যোগ।'

এই বক্তব্য সুইটি বেগমের। তার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতার একটি খণ্ডাংশ এটি। সুইটি দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ উপজেলার বেহাগা গ্রামের ছাত্র কল্যাণ সমিতির সহসভাপতি এবং বর্তমানে রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইসলামিক ইতিহাস বিভাগে মাস্টার্স-এ অধ্যয়নরত।

সুইটি একা নয়, একটি দল। এ দলে আছে আরিফ, সুইটি, উজ্জ্বল, কাজল, সোহেল, পারভীন, মোমেনা, সাদেকুল, সুমী, মনি, হাবিবুল, মামুন, বুলেট, মিজানুর, রবিউল, শাহমিন। এরা সবাই ছাত্রছাত্রী- হাইস্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। এদেরই সমবেত উদ্যোগেই গড়ে ওঠে ছাত্র কল্যাণ সমিতি, ২০০৩ সালে। আমার সঙ্গে এই সংগঠনের পরিচয় ঘটে ২০০৭ সালে মুশিদহাট ইউনিয়নে ইউএনডিপির একটি পাইলট প্রজেক্টের গবেষণার কাজ করার সময়। তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কিভাবে টিকে আছে এই স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যোগ? সবাই বলেছে, ছাত্র কল্যাণ সমিতি টিকে থাকবে আমরা না- থাকলেও, এখন যারা ছোট তারা বড় হয়ে আমাদের মতো চালাবে। এই সংগঠনের সদস্য হওয়া এখন একটি মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সংগঠনটি হয়ে উঠেছে পুরো গ্রামের একটি সমন্বয় সেতু। সদস্যরা জানায়, সংগঠন চলে সদস্যদের অর্থে, সদস্যরা অনেক কষ্ট করে এই অর্থের জোগান দেয়। আমাদের মধ্যে অনেকে আছে, যারা প্রথম দিকে এই অর্থের জোগান দিতে ঈদের জামাকাপড় পর্যন্ত কেনেনি। এখন অবশ্য আর সেরকম সমস্যা নেই। কারণ এখন গ্রামের অনেকেই সাহায্য করছে। তাছাড়া সদস্যদের মধ্যে এখন অনেকে চাকরি করে, অনেকে ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত, অনেকে এলাকার বাইরে আছে কিন্তু সদস্য চাঁদা নিয়মিত দিতে হয়তও ভোলে না।

কি করে ছাত্র কল্যাণ সমিতি?

শুরু হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ফ্রি প্রাইভেট পড়ানো দিয়ে। তাদেরই পড়ানো হয় যাদের বাবা-মা এত দরিদ্র যে তারা তাদের সন্তানদের পড়ালেখার জন্য যে সামান্য ব্যয় করতে হয় তাও বহন করার সামর্থ্য রাখেন না। ফলে এসব শিশু হয় স্কুলের যায়ই না, অথবা দ্রুতই ঝরে পড়ে। শিশু নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক দিকটির পাশাপাশি আরও দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়- এক. দরিদ্র বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীর সন্তান নির্বাচন করা হয় সবার আগে। যাতে করে এই সন্তানরা দ্রুত লেখাপড়া শিখে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তার কষ্ট ঘোচাতে পারে এবং দুই. এরপর অগ্রাধিকার দেয়া হয় কন্যাশিশুর প্রতি, যাতে করে তারা ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী হয় এবং সবাই সুইটির মতো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। এসব গভীর সম্পৃক্ততার লক্ষণ আগে এতটা ঘটেনি, কারণ গ্রামবাসী এত গভীরভাবে সম্পৃক্ত হবার সুযোগই পায়নি। গণগবেষণা এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

ছাত্র কল্যাণ সমিতিতে যৌথ চিন্তা ছিলই, যৌথ মালিকানাও ছিল। তা না হলে যৌথ উদ্যোগ টিকে থাকে কি করে। কিন্তু এসব ছিল অনেকাংশে সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্ভাবনা ও সঙ্কটের অনেকই সদস্যরা জানত। তারা মোকাবিলাও করত। এটা অবশ্যই শক্তি। কিন্তু সঙ্কটের সমাধান সদস্যদের পক্ষে সামলিয়ে ওঠা দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠছিল। যেমন অর্থ। গণগবেষণার মধ্য দিয়ে যখন গ্রামবাসীর সঙ্গে সঙ্কট ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। তখন ফল হলো এই যে গ্রামবাসী তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করল। এখন ফ্রি না পড়িয়ে ১০ টাকা করে মাসিক বেতন নেয়া হোক। দরিদ্র বাবা-মারা এতে সায় দেয়। কারণ তারা চাচ্ছিল এ উদ্যোগ টিকে থাক। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা এই ১০ টাকা ফি দিত না, তারা নিজেরাই এবার তা দিতে এগিয়ে এলো। নতুন সদস্য যারা এতদিন এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মালিকানা নিয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখেনি, তারাও এবার আরও বেশি করে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিতে শুরু করল। শহরের একদল ছেলেমেয়ে এ খবর জেনে এগিয়ে এলো শিক্ষকতা করতে এবং আর্থিক সাহায্য করতে। তারা বই সংগ্রহ করে দেবার কথাও বলল। প্রশ্ন উঠল, বাইরের অর্থ নেয়া ঠিক হবে কি না? সমাধান এলো বাইরের অর্থ নিতে অসুবিধা নেই, যদি কোন শর্ত না থাকে। তবে চেষ্টা থাকবে নগদ অর্থ না নিয়ে উপকরণের মধ্য দিয়ে সহযোগিতা নিতে।

একদল নিরক্ষর নারীর পরিবর্তন

বেহাগা গ্রামেরই নিরক্ষর একদল নারী যাদের সন্তানরা ছাত্র কল্যাণ সমিতিতে পড়ত, সন্তানদের লেখাপড়ার অগ্রগতি দেখে নিজেরাও লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। একদিন তারা নিজেরাই তাদের এ আগ্রহ ছাত্র কল্যাণ সমিতির সদস্যদের কাছে ব্যক্ত করেন। সংগঠকরা গ্রামবাসীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে মুরুব্বিদের মধ্যে, বিশেষ করে যারা নারীর পর্দানশীন হওয়াকে অধিক জরুরি মনে করেন শিক্ষার চেয়েও, তাদের বাধা থাকলেও অধিকাংশ বিষয়টিতে সম্মতি দেন। ব্যস। শুরু হয় এই নিরক্ষর নারীদের শিক্ষা জীবন। এখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এই নারীদের প্রথম পর্যায়ে শিক্ষক নির্বাচন করা হয় তাদের সন্তানদেরই। ঠিক করা হয়, মায়েরা তাদের সন্তানদের কাছে প্রতিদিন পড়া শিখবে। একটা নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করার পর অন্যরাও সাহায্য করবে। সেতাবগঞ্জ শহর থেকে যে ছেলেমেয়েরা এসেছিল সহযোগিতা করতে এবার তাদের ডাক পড়ল। তাদের আহ্বান করা হলো, তারা এই নিরক্ষর নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে সময় দিতে আগ্রহী কি না। কয়েকজন আগ্রহ দেখালে তাদের জন্য সময়সূচি করে দেয়া হলো। এ প্রক্রিয়া ২০০৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়ে নভেম্বর পর্যন্ত চলে।

এই নিরক্ষর নারীর একজন ছিলেন লাইলী বেগম। তিনি ২০০৭-এ এসে অন্য নারীদের নিয়ে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। সমিতির নাম দেন 'বেহাগা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি'। গণগবেষণা থেকেও তিনি সংগঠিত হবার এবং সংগঠন গড়ে তোলার ধারণা ও তাগিদ পান। ঘটনাক্রমে এই নারীর দল ইউএনডিপির সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদে গড়ে ওঠা কমিউনিটি ই-সেন্টার (টেলিসেন্টার)-এর অনেক তথ্যভাণ্ডারের মধ্যে জমি রেজিস্ট্রেশন করার নিয়মকানুন দেখার সুযোগ পান তার নিজ গ্রামেই। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে এই তথ্যভাণ্ডার তার সঙ্গে গ্রামের অনেকেই দেখে। পরের দিন অন্য নারীদের সংগঠিত করে তিনি ইউনিয়ন পরিষদে যান এবং একই তথ্যভাণ্ডার অন্য নারীদের দেখাতে অনুরোধ করেন আরও স্বচ্ছ ধারণা নেবার জন্য। দেখার পর এই নারীরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন তাদের জমির দাম অন্যরা প্রতারণা করে কম নিয়েছেন, এটার প্রতিকার করতে। এরপর এই নারীরা ছাত্র কল্যাণ সমিতিতেও বিষয়টি জানান। ছাত্র কল্যাণ সমিতির আগে এমন বিষয় নিয়ে ভাবেনি। কিন্তু তাদের মাধ্যমে একদল নারী নিরক্ষরমুক্ত হয়ে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্যসচেতন হয়ে তাদের পরিবর্তনের লক্ষ্যে সহযোগিতা চাইছে তা তো আর ফিরিয়ে দেয়া যায় না। ছাত্র কল্যাণ সমিতির সদস্যরাও ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদে যোগাযোগ করে। পরে দেখা যায় সত্যি সত্যিই তাদের পড়শি এই লাইলী বেগম ও অন্যদের প্রতারণা করে কম দামে বেশি জমি নকশা নিয়েছেন। এ নিয়ে পরবর্তী সময়ে সালিশী হয় এবং লাইলী বেগমকে তার বাড়তি অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা হয় সেই পড়শিকে।

লাইলী এখন নেতা

লাইলী বেগমের এই ঘটনা এলাকায় নিরক্ষর নারীদের মধ্যে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পাশের গ্রামের এমনকি পাশের ইউনিয়ন থেকে নারীরা এখন লাইলীর সংগঠন দেখতে আসছে, এসে পরামর্শ চাচ্ছে কি করে তারাও এমন সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। লাইলী বেগমের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তিনি এবং তার সমিতির সদস্যরা ইতোমধ্যে পাশের আরও চারটি গ্রামে সমিতি